মৃত্যুক্ষুধা

মৃ ত্যু ক্ষু ধা

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

মৃত্যুক্ষুধা
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Mrittukhudha by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: January 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99576-0-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগীদের উদ্দেশে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

এক

পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।

যেন কোনো খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।

খোকার চলে-যাওয়া পথের পানে জননীর মতো চেয়ে আছে—খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে।

এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মতো করে গাছপালার আড়াল টেনে রাখা।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মুসলমান আর 'ওমান কাত্‌লি' (রোম্যান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশি কনভার্ট ক্রিশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়।

এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু-চার ঘর আছে—চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মতো। তবে তাদেরও আভিজাত্য-গৌরব ওখানকার মুসলমান-ক্রিশ্চান—কারুরই চাইতে কম নয়।

একই-প্রভুর-পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে—এরাও যেন তেমনি। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করার মতো উৎসাহ এবং অবসর নেই বেচারাদের জীবনে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে—অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐরকমের কোনো-একটা-কিছু করে। আর, মেয়েরা ধান ভানে, ঘর-গেরস্তালির কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

বিধাতা যেন দয়া করেই এদের জীবনে দুঃখকে বড় করে দেখবার অবকাশ দেননি। তাহলে হয়তো মস্ত বড় একটা অঘটন ঘটত।

এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম! অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই! আমদানি হতে যতক্ষণ, রপ্তানি হতেও ততক্ষণ!

মাথার ওপরে টেরির মতো এদের মাঝে দু-চারজন 'ভদ্দর-নুক'ও আছেন।

কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি। ঐটেই যেন ওদের দুঃখকে বেশি উপহাস করে।

বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিত মনে পান্তা-ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাচবিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজেঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—রোদে-পোড়া, ধূলিমলিন, ক্ষুধার্ত, গায়ে জামা নেই। অকারণ ঘুরে বেড়ায়, কাঠ কুড়োয়, সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে এবং সেই সঙ্গে খাঁটি বাংলা ভাষার চর্চা করে।

এরাই থাকে চাঁদ-সড়কের চাঁদবাজার আলো করে।...এই চাঁদ-সড়কেরই একটা কলতলায় জল-নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের মধ্যে একটা ধুমখাত্তর ঝগড়া বেধে গেল।

কে একজন ক্রিশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়তো একদিন এক জাতিই ছিল—কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রিশ্চান। আর এক কালে এক জাত ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই জাতের দুইটি মেয়েই কম-বয়সী এবং তাদের বন্ধুত্বও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ঐ মেয়ে দুটি করেনি। করছে তারা—যারা এই অনাসৃষ্টি দেখেছে।

গজালের মার পাড়াতে কুঁদুলী বলে বেশ নামডাক আছে। সে-ই 'অপোজিশন লিড' করছে মুসলমান-তরফ থেকে।

অপর পক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মার মতো ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না!—একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতোই!

গজালের মা গজালের মতোই সরু—হাড্ডি-চামড়াসার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতোই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মার কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না।

ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশি চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, 'হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?'

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুংকার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বই কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!'

গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসির সবটা জল মাটিতে ঢেলে ফেলে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'ওলো আগ-ধুমসী (রাগধুমসী)! ওলো ভাগলপুরে গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল—জজ সায়েবের লো, ইংরেজের!'

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল, 'আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি, অ'গজালের মা! ঐ জজসাহেবও আমাদেরই জাত। আমরা 'আজার' (রাজার) জাত, জানিস?'

দু-তিনটি ক্রিশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা বলেছিস মাসি!'

খাতুনের মা কাঁখে কলসি, পেটে পিলে আর কাঁধে ছেলে নিয়ে এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো গজালের মার সুরে মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনী কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে, পিলে আর কলসি-সমেত সে একেবারে মূলগায়েনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল এবং ক্রিশ্চানদের বৌদের লক্ষ্য করে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লেখা তো যায়ই না, শোনাও যায় না।

এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে 'এলোকেশী বামা' হয়ে দাঁড়াল এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বার কয়েক বিচিত্র-ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তুই আবার কে লো উঝড়োখাগি! তবু যদি ভাতারের ধুমসুনি না খেতিস দুবেলা!' তারপর তার অপ-ভাষাটার উত্তর তার চেয়েও অপ-ভাষায় দিয়ে সে গজালের মার পানে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ লা ভাতার-পুতখাগি! তিন ব্যাটাখাগি। তোর ছেলে না হয় জজ সায়েবের বাবুর্চিগিরি করত, আর সে ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে। আর তুই নিজে যে সেদিন আমফেসাদ বাবুর (রামপ্রসাদ বাবুর) হাঁড়ি ঠেলে রুনুন (উনুন) কেড়ে এলি! ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবি সাহেব নাকি লা? হাত শোঁক, এখনও খেরেস্তানের গন্ধ পাবি!'

এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটু ছুরির মতো ধারালো হাসি হেসে, 'বলি ওলো হুতমোচোখি, ঐ 'আমফেসাদ' বাবু তো আমার তলপেটে চালের পোঁটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো (হয়েছিল), তাই ওর বাড়ি চাকরি করতে গিয়েলাম (গিয়েছিলাম), তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়িতে? বলুক, দেখি কোন কড়ই-রাঁড়ি বলবে!'

শেষের কথাগুলো হিড়িম্বার কানে যায়নি। সে 'ছিটেন পাড়ার' (প্রোটেস্টান্ট পাড়ার) পাদরি সাহেব মিস্টার রামপ্রসাদ হাতির বাড়ি চাকরি করতে গিয়ে সত্যিই একবার চাল চুরির জন্য মার খেয়েছিল। কিন্তু সে কেলেঙ্কারির কথাটা এতগুলো মেয়ের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়াতে সে এইবার যা কাণ্ড করতে লাগল—তা অবর্ণনীয়! চুল ছিঁড়ে, আঙুল মটকে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, নেচে, কুঁদে সে যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে গালির বিগলিত ধারা—অনর্গল গৈরিকস্রাব!

যত গালি তার জানা ছিল ভব্য, অভব্য, শ্লীল, অশ্লীল, সবগুলো একবার, দুবার, বারবার আবৃত্তি করেও তার যেন আর খেদ মেটে না!

'লুইস-গানার' যেন মিনিটে সাতশ করে গুলি ছুড়ছে!

ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল! ঝগড়া তো নয়, মোরগ-লড়াই!

ওরই মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পচা রে, উই শালা পচা! ছুটে আয় রে ছুটে আয়! তোর দিদিমা 'মা-কালি' হয়ে গিয়েছে!'

এই কুডুম-তাল ঝগড়ার মধ্যেও কয়েকটা বৌ-ঝি হেসে ফেলল!

মুসলমান তরফের একটি বৌ আর থাকতে না পেরে ঘোমটার ভিতর থেকেই বলে উঠল, 'হাতে একখানা খাঁড়া দিলেই হয়!'

তার চেয়েও সুরসিকা একটি আধ-বয়সী মেয়ে পিছন থেকে বলে উঠল, 'কাপড়টাও খুলে পড়তে আর বাকি নেই লো!'

মুসলমান ছেলেমেয়েরা যত না হাসে, তত চেঁচায়!

ক্রিশ্চান ছেলেরা ছোড়ে ধুলো।

বেঁধে যায় একটা কুরুক্ষেত্তর!...

কিন্তু দুঃখের ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়ে এ কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্য ঘটনা—একেবারে 'মাছভাত'!

ঝগড়া হতেও যতক্ষণ—ভুলতেও ততক্ষণ।

দুঃখ অভাব হয়তো এদের মঙ্গলই করেছে। এত দুঃখ যদি এদের না থাকত তাহলে এমন প্রচণ্ড ঝগড়ার পরের দিনই আবার 'দিদি' 'বুবু' 'খালা' বলে হেসে কথা কইতে ওদের বাধত!

এরা সব ভোলে—ভোলে না কেবল তাদের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত অভাব!

এই না-ভোলা দুঃখের পাথারে এরা যেন চর-ভাঙা গাছের শাখা ধরে ভেসে চলছে। দুঃখের যন্ত্রণায় মন থাকে এদের তিক্ত হয়ে, ভাষাও বেরোয় তাই কটু হয়েই; কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখে—সে একা অসহায়, ভাসছে অকূল-পাথারে, তখন সে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়—যাকে সে এতক্ষণ ধরে অতি বড় কটূক্তি করেছে।

তাদের এ জলের জীবন-যাত্রায় কি ডাঙার সুখী মানুষের মতো পরম নিশ্চিন্ত মনে বৎসরের পর বৎসর ধরে এ ওর পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবার উপায় আছে?

এ দুঃখের বোঝা যদি এদের এত বিপুল না হয়ে উঠত, তাহলে এরাও এতদিন ভদ্রলোকের মতো মানুষ জাতির মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াত—বড় বড় যুদ্ধ বাধিয়ে দিত!

দুই

গজালের মার ছোট ছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটার দলে নাচে, সখি সাজে, গান করে। কাজও করে—রাজমিস্ত্রির কাজ।

বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে। টেড়ি কাটে, 'ছিকরেট' টানে, পান খায়, চা খায়। পাড়ার মেয়ে মহলে তার মস্ত নাম। বলে—'যেমন গলা,

তেমনি গান, তেমনি শৌখিন! 'থিয়েটারে' লাচে—বাবুদের ঠিয়েটারে, ঐ খেরেস্তান পাড়ার যাত্তার গানে লয়। হুঁ হুঁ!'

সে যখন 'ফুট-গজ' 'কন্নিক' আর 'সুত' নিয়ে 'ছিকরেট' টানতে টানতে কাজে যায় আর যেতে যেতে গান ধরে, তখন পাড়ার বৌ-ঝিরা ঘোমটা বেশ একটু তুলেই তার দিকে চায়। 'ভাবি' (বৌদি) সম্পর্কের কেউ হয়তো একটু হাসেও। আর অবিবাহিতা মেয়ের মায়েরা আল্লা মিঞাকে জোড়া মোরগের গোশতের লোভ দেখিয়ে বলে, 'হেই আল্লাজি, আমার কুড়ুনির সাথেই ওর জোড়া লিখো।'

ঘরে সেদিন চা ছিল না। তাই প্যাঁকালে নেদের পাড়ার বাবুদের বৈঠকখানা হতে একটু চায়ের প্রসাদ পেয়ে এসে কাউকে কিছু না বলেই কন্নিক নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়বার জোগাড় করছিল।

তার মা একটু অনুনয়ের স্বরেই বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই যে কাজে যাচ্ছিস বড়? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে। কাল আত্তির (রাত্তির) থেকে কষ্ট পাচ্ছে, এখনও তো কিছু হলো না।'

প্যাঁকালে তখন কন্নিক ফুট-গজ সামনে রেখে থালায় একথালা জল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার তেলচিটে চুলে বেশ করে বাগিয়ে টেড়ি কাটছিল। আয়নার অভাব সে কিছুদিন থেকে থালার জলেই মিটিয়ে আসছে।

চার আনা দামের একটি আয়না সে কিনেও ফেলেছিল একবার; কিন্তু একদিন চা খাওয়ার পয়সা না থাকাতে সেটা দুপয়সায় বিক্রি করে দোকানে চা খেয়ে এসেছে। এখন যা পায়, তাতে চালই জোটে না দুবেলা, তা আয়না কিনবে কি!

কিছুদিন থেকে সে রোজই তার রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়িতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছআনায় সকলের উপযোগী চালই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও বের করতে হয় কোঁচড় থেকে।

বয়স তার এই আঠারো-উনিশ। কাজেই চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখটা ভুলতে আজও তার বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু তার আয়নার জন্য তার পিতৃহীন ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝিগুলি ক্ষুধিত থাকবে—এ যখন মনে হয়, তখন তার নিজের অভাব আর অভাবই বোধহয় না।

সেদিন ঝগড়ার ঝোঁকে হিড়িম্বা সবচেয়ে ব্যথা-দেওয়া গাল তার মাকে যেটা দিয়েছিল, সে ঐ 'তিন ব্যাটাখাগি'। সত্যিই তো পাহাড়ের মতো জোয়ান তিন ভাই-ই তার মার চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল! তার ওপর আবার সবারই দু-চারটে করে ছেলেমেয়ে আছে; এবং তারা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।

এই শিশুদের এবং তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোঝা বইবার দায়িত্ব একা তারই। কিন্তু বোঝা তাকে একা বইতে হয় না। তার মা এবং ভ্রাতৃজায়ারা মিলে ও বোঝা হালকা করবার জন্য দিবারাত্রি খেটে মরে। ওতে বোঝা হালকা হয়তো একটু হয়; কিন্তু ক্লান্তি কমে না। ওরা যেন মস্ত একটা খাড়া পাহাড়ের গড়ানে 'খাদ' বেয়ে

চলেছে, মাথার এঁটে-দেওয়া বিপুল বোঝা, একটু থামলেই বোঝা-সমেত হুড়মুড় করে পড়বে কোন এক অন্ধকার গর্তে।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া! কিছুদিন থেকে আবার ওর ছোট বোনটাও এসে ওদের ঘাড়ে চড়েছে! বিয়ে দিয়েছিল ওর ভালো বর-ঘর দেখেই! কিন্তু কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই! ওতে কপাল যথেষ্টই ফোলে; কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না—পাঁচির স্বামী নাকি কোন এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান করে নেকা করেছে! কিন্তু তার স্বামীর অর্ধেক রাজত্বে পাঁচির মন উঠল না। একদিন তার অনাগত শিশুর শুভ সংবাদসহ অর্ধেক রাজত্বের সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে মায়ের দুঃখের কোলেই সে ফিরে এলো।

অভাবের দিনে প্রিয় অতিথি আসার মতো পীড়াদায়ক বুঝি আর কিছু নেই! শুধু হৃদয় দিয়ে দেবতার পূজা হয়তো করা যায়; কিন্তু শুধু-হাতে অতিথিকে বরণ করা চলে না। শুধু-হাতের লজ্জা সারা হৃদয় দিয়েও ঢাকা যায় না।

পাঁচি এলো চোখ-ভরা জল নিয়ে। দুঃখিনী মা তার চোখের জল মুছাবারও সাহস করলে না। বড় আদরের একটি মাত্র মেয়ে তার—তার সর্বকনিষ্ঠ কোল-পোঁছা সন্তান। বুকে সে তুলে নিল তাকে; কিন্তু তাতে শান্তি সে পেল না, বুক তার ফেটে যেতে লাগল কান্নায়, বেদনায়! মা কেঁদে উঠল, 'ওরে হতভাগিনী মেয়ে, এ কাঁটার বুকে শুধু যে ব্যথাই পাবি মা আমার! এখানে সুখ-শান্তি কোথায়?'

মেয়ের প্রথম সন্তান পিত্রালয়েই হয়—এ-ই দেশের চিরচলিত প্রথা। অতি বড় দুঃখীও তার মেয়ে প্রথম সন্তান-সম্ভাবিতা হলে নিজে গিয়ে মেয়েকে আনে, সাধ-আরমান করে, মেয়েকে 'সাধ' খাওয়ায়। পাঁচি যখন প্রসব-বেদনায় আর্তনাদ করছিল অথচ অর্থাভাবে ধাত্রীও ডাকতে পারা যাচ্ছিল না কাল রাত্রি থেকে, তখন তার মার যন্ত্রণা বুঝছিলেন—যদি বেদনার বোধশক্তি তাঁর থাকে—এক অন্তর্যামী!

নিজে থেকে এসেছে বলেই—এবং মেয়ের কপাল পুড়েছে বলেই কি তার যত্ন-আদরও হবে না একটু? কিন্তু হয় কীসে?—নিঃসম্বল জননী কাঁদে, ছুটে বেড়ায়; কিন্তু করতে কিছুই পারে না।

ছেলের ওপর অভিমান করে কিছুই বলেনি এতক্ষণ; কিন্তু আর সে থাকতে পারল না। ছেলের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, 'ওরে, পাঁচি যে আর বাঁচে না।'

চা খেয়ে এসেও প্যাঁকালের উষ্মা তখনও কাটেনি। সে টেড়ি কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই বলল, 'মরুক! আমি তার কী করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?'

সত্যিই তো, সে কী করবে! টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায়!

হঠাৎ পুত্র মুখ তুলে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'রোজ ঝগড়া করবি নুলোর মার সঙ্গে, নইলে সে-ই তো এতক্ষণ নিজে থেকে এসে সব করত!'

নুলোর মা আর কেউ নয়—আমাদের সেই ভীমা প্রখর-দশনা শ্রীমতী হিড়িম্বা! সে শুধু ঝগড়া করতেই জানে না, একজন ভালো ধাত্রীও।

ইতিমধ্যেই পাঁচি চিৎকার করে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। মায়ের প্রাণ, আর থাকতে পারল না। বৌদের ডেকে মেয়েকে দেখতে বলে সে তাড়াতাড়ি হিড়িম্বাকে ডাকতে বেরিয়ে পড়ল।

হিড়িম্বা তখন তার বাড়ির কয়েকটা শশা হাতে নিয়ে বাবুদের বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছিল। পথে গজালের মার সঙ্গে দেখা হতেই সে মুখটা কুঁচকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। কিন্তু গজালের মার তখন তা লক্ষ করবার মতো চোখ ছিল না। সে দৌড়ে হিড়িম্বার হাত দুটো ধরে বলল, 'নুলোর মা, আমায় মাফ কর ভাই! একটু দৌড়ে আয়, আমার পাঁচি আর বাঁচে না!'

হিড়িম্বা কথা কয়টা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। সে একটু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ কী ন্যাকামি লা? তুই কি আবার কাজিয়া করবি নাকি পাড়ার মাঝে পেয়ে?'

গজালের মা কেঁদে ফেলে বলল, 'না বোন সত্য বলছি, আল্লার কিরে! আমার পাঁচির কাল থেকে ব্যথা উঠেছে; ঝগড়া তোর গজালের মার সঙ্গেই হয়েছে, পাঁচির মার সঙ্গে তো হয়নি!'

হিড়িম্বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি? তা আত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে—আর আমায় খবর পাঠাসনি? আচ্ছা মা যা হোক বাবা তুই! আমরা হলে ধন্না দিয়ে পড়তাম গিয়ে। চ দেখি গিয়ে!'

হিড়িম্বা যেতেই পাঁচি কেঁদে উঠল, 'মাসি গো, আমি আর বাঁচব না।'

হিড়িম্বা হেসে বলল, 'ভয় কী তোর মা; এই তো এখনি সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি!'

পাঁচি অনেকটা শান্ত হলো। ধাত্রী আসার সান্ত্বনাই তার অর্ধেক যন্ত্রণা কমিয়ে দিল যেন।

একটু তদবির করতেই পাঁচির বেশ নাদুসনুদুস একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হলো। সকলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওলো, ছেলে হয়েছে লো! ছেলে হয়েছে যে!'

ওদের খুশি যেন আর ধরে না! ওরা যেন ঈদের চাঁদ দেখেছে!

হিড়িম্বা মূর্ছিতাপ্রায় পাঁচির কোলে ছেলে তুলে দিয়ে বলল, 'নে, ছেলে কোলে কর। সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে!'

পাঁচি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল!

নবশিশুর ললাটে প্রথম চুম্বন পড়ল না কারুর, পড়ল দুঃখী মায়ের অশ্রুজল!

গজালের মা হিড়িম্বার হাত ধরে বলল, 'দিদি, আমায় মাফ করো!'

হিড়িম্বার চোখ ছলছল করে উঠল। সে কিছু না বলে সস্নেহে খোকার কপালে পড়া তার মায়ের অশ্রুজল-লেখা মুছিয়ে দিল।

বাইরে তখন ক্রিশ্চান ছেলেদের দেখাদেখি মুসলমান ছেলেরাও গাচ্ছে—

'আমরা যিশুর গুণ গাই।'

তিন

এই সব ব্যাপারে কাজে যেতে সেদিন প্যাঁকালের বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। তারি জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্ত্রি এসে তাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল।

প্যাঁকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এলো। সে জানত, কাল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরদের দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা বসেছে। তাদের কিচিরমিচির বক্তৃতায় আর নেংটে ভলান্টিয়ারদের হুটোপুটির চোটে সারা রাত তার ঘুম হয়নি।

কিন্তু চাল যদি বা চারটে যোগাড় করা যেত ধারধুর করে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুনশালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও ঘর নিকুতে সন্ধে হয়ে যাবে।

ঘরে তাদের চালের হাঁড়িগুলো যেমন ফুটো, চালও তেমনি সমান ফুটো। সেখানে বাসা বাঁধবার খড় না পেয়ে চড়াই পাখিগুলো অনেক দিন হলো উড়ে চলে গেছে। কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশি টানাটানি ছিল তাদের জায়গার।

যেটা উনুনশাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাত্রে জনসাতেকের শোবার ঘর। তারই একপাশে দরমা বেঁধে গোটা বিশেক মুরগি এবং ছাগলের ডাকবাংলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

প্যাঁকালে না খেয়েই কাজে গেল, তার মাও তা দেখল। কিন্তু ঐ শুধু দেখল মাত্র, মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন, চোখে কিন্তু তার জল দেখা গেল না। বরং দেখা গেল সে তার মেয়ের আঁতুড়ঘরে ঢুকে তার খোকাকে কোলে নিয়ে দোলা দিতে কী সব ছড়া-গান গাচ্ছে।

একটি ছোট্ট শিশু তার জোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকালমৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে!

প্যাঁকালে যেতে যেতে তার মার খুশিমুখ দেখল, বোনের ছেলেকে নিয়ে গানও শুনল। চোখ তার জলে ভরে এলো। তাড়াতাড়ি কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখ দুটো মুছে সে হাসতে হাসতে বার হয়ে পড়ল!

রাজমিস্ত্রি দলের মোনা প্যাঁকালের সুরকি-লাল কোটটার পকেটে ফস করে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'লে ভাই, একটা 'ছিকরেট' বের কর! বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ, শালা হয়তো এতক্ষণ দাঁত খিঁচুচ্ছে।'

প্যাঁকালে পথ চলতে চলতে বলল, 'ও গুড়ে বালি রে মনা, ছিকরেট ফুরিয়ে গেছে।'

আল্লারাখা তার কাছা খুলে কাছায়-বাঁধা বিড়ির বান্ডিলটা সাবধানে বের করে বলল, 'এই নে, খাকি ছিকরেট আছে, খাবি?'

কুড়চে বান্ডিল থেকে ফস করে একটি বিড়ি টেনে নিয়ে সাহেবদের মতো করে বাম ওষ্ঠপার্শ্বে চেপে ধরে ঠোঁট-চাপা স্বরে বলল, 'জিয়াশলাই আছে রে গুয়ে, জিয়াশলাই?'

গুয়ে তার 'নিমার' ভেতর-পকেট থেকে বারুদ-ক্ষয়ে-যাওয়া ছুরিমার্কা দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে কুড়চের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখিস, একটার বেশি কাঠি পোড়াসনে যেন। মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।'

কুড়চে কাঠির ও খোলের দুরবস্থা দেখে বলল, 'তুই-ই জ্বালিয়ে দে ভাই, শেষে বলবি, শালা একটা কাঠি নষ্ট করে ফেলল।'

গুয়ের ওদিক দিয়ে মস্ত নাম। ঝড়ের মধ্যেও সে এমনি কায়দা করে দেশলাই ধরাতে পারে যে, কাঠিটা শেষ হয়ে না পোড়া পর্যন্ত নিবে না!

দেশলাইয়ের খোলার ঘষা-বারুদে গুয়ে কৌশলের সঙ্গে আধখানা কাঠিটি নিয়ে একটি ছোট্ট টোকা মেরে জ্বালিয়ে ফেলেই দুই হাতের তালু দিয়ে তার শিখাকে বাতাসের আক্রমণ হতে রক্ষা করে এমন করে কুড়ুচের মুখের সামনে ধরল যে, তা দেখবার জিনিস।

বিড়িটা যতক্ষণ না আঙুল পুড়িয়ে ফেলল, ততক্ষণ এ-মুখ ও-মুখ হয়ে ফিরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্দার মিস্ত্রির, আর যার বাড়িতে কাজ করছে তার চৌদ্দ-পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধও হতে লাগল।

'ওমান কাত্‌লি' পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা। একটা বিশিষ্ট ঘরের সামনে গিয়েই প্যাঁকালে গান ধরে দিলে :

'কালো শশী রে, বিরহ-জ্বালায় মরি!'

তাকে কিন্তু বেশিক্ষণ বিরহ-জ্বালায় মরতে হলো না! বাড়ির ভিতর থেকে কলসি-কাঁখে একটি কালোকুলো গোলগাল মেয়ে বেরিয়ে এলো।

মেয়েটি যেন একখানা চার পয়সা দামের চৌকো পাউরুটি। কিন্তু মোটা সে একটু বেশি রকমের হলেও চোখে-মুখে তার লাবণ্য ছিল অপরিমিত, চোখ দুটি যেন লাবণ্যের কালো জলে ক্রীড়ারত চটুল সফরি—সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে ভুরু জোড়া যেন গাঙচিলের ডানা—ঐ সফরির লোভে, চোখের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে।

না বলা কথার আবেশে পাতলা ঠোঁট দুটি কাঁপছে কচি নিমপাতার মতো।

নাকটি যেন মোহনবাঁশি। চিবুকের মাঝখানটিতে নাশপাতির মতো ছোট্ট টোল।

শ্রাবণ-রাতের মেঘের মতো চুল।

কিন্তু মুখের ওর এত লাবণ্যকে যেন বিদ্রুপ করছে ওর বাকি শরীরের স্থূল চৌকো গড়ন।

মেয়েটি মধু ঘরামির। মধু আগে মুসলমান ছিল, এখন 'ওমান কাত্‌লি' হয়েছে।

মেয়েটির নাম কুর্শি। বয়স চৌদ্দর কাছাকাছি। দেখে কিন্তু ষোলো-সতেরো বলে ভ্রম হয়। একটু বেশি বাড়ন্ত।

সর্দার মিস্ত্রির মিষ্টি আলোচনা তখন দলের মধ্যে এমনি জোরের সঙ্গে চলছিল যে, তারা দেখতেই পেল না, কখন কুর্শি তাদের কচার বেড়ার ধারে চোখ-ভরা ইঙ্গিত নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং প্যাঁকালেও হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু কথা বলবার তারা সুযোগ পেল না। পিছনে একটা গরুর গাড়ি আসছিল—প্যাঁকালে তা খেয়াল করেনি। গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু মেয়েটার গতিবিধি লক্ষ করছিল। কচাগাছের কাছে কলসি নিয়ে সাতজন্ম দাঁড়িয়ে থাকলেও যে জল পাওয়া যায় না, এ তো জানা কথা। গাড়োয়ানটা তার উৎসাহ থামিয়ে রাখতে পারল না। হঠাৎ গেয়ে উঠল :

'ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল!'

গান তো নয়, ঋষভ চিৎকার! সে চিৎকারে ছোঁড়া-ছুঁড়ির প্রেম ততক্ষণে হৃদয়দেশ ত্যাগ করে বহু ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে গেছে!

প্যাঁকালে অকারণে পাশের রেতো কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। গাড়োয়ান শুনতে পায় এমনি চেঁচিয়েই বলল, 'এই! আমার বড়শিটা কখন দিবি?' বলা বাহুল্য, কামারকে সে বড়শি গড়তে কোনো দিনই দেয়নি।

ওদিকে কুর্শি হঠাৎ কলসি নামিয়ে একটা কচার ডাল ভেঙে পাশের ছাগলটাকে অকারণে দুঘা কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'পোড়ারমুখীর ছাগল রোজ রোজ এসে বেগুন গাছ খেয়ে যাবে!'

এখানেও বেগুন গাছের উল্লেখটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

রসিক গাড়োয়ান গান গাওয়ার মাঝে ডাইনের বলদটার ঠেশে ল্যাজ মুষড়ে দিয়ে এবং বামের বদলটার তলপেটে বাম পা'টার সাহায্যে বেশ করে কাতুকুতু দিয়ে—জিহ্বা ও তালু-সংযোগে জোরে দুটো টোকর মেরে শেষের কলিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল—'ও ছুঁড়িরা মজাইল, হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল।'

যন্ত্রণায় ও কাতুকুতুর ঠ্যালায় বলীবর্দ যুগল ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ছুট দিল।

প্যাঁকালে একবার হতাশ নয়নে ছাগল-তাড়না-রত কুর্শির দিকে তাকিয়ে দৌড়ে জুড়িদের সঙ্গ নিল। তখনও গাড়ি ছুটছে; কিন্তু গাড়োয়ানের মুখ ফিরে গেছে পিছন দিকে।

গাড়ির ধুলোর ভয়ে দলের ওরা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। জনাব বলে উঠল, 'উঃ শালার গলা তো নয়, যেন হাঁড়োল! ও শালা কে রে?'

প্যাঁকালে কটু কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঐ শালা ন্যাড়া গয়লা—শালা গান করছে না তো, যেন হামলাচ্ছে।'

সকলেই হেসে উঠল।

হঠাৎ ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খড়্গ পাচে।'

অমনি সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ঐ ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করল তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় রে?'

অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্যাঁকালে বলল, 'উ-ই যে, নীল চোঁয়ায়।'